

strikes, Vol. 2).

সহজ কথায় বিপর্যয় বা disaster-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- (a) বিপর্যয় আকস্মিক ও দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী।
- (b) বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদহানি ও বিপুল সংখ্যার মানুষের জীবনহানি হয়। তবে সম্পদ ও জীবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ সহজ নয়। বিভিন্ন সময়, পরিস্থিতি ও দেশভেদে এই পরিমাপের পার্থক্য হয়। 2001 সালের World Disaster Report-এ বলা হয়— কোনো দুর্ঘটনা তখনই বিপর্যয় বলে গণ্য হবে যখন—
  - (1) দশ বা তার বেশি মানুষের মৃত্যু হবে।
  - (2) একশো বা তার বেশি মানুষ আহত হবে।
  - (3) পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্যের দরকার হবে।
  - (4) সরকারিভাবে আপৎকালীন পরিস্থিতি ঘোষিত হবে।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা (Natural Hazard Research Group) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে— কোনো দুর্ঘটনায় কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ হানি, অন্তত একশো মানুষের মৃত্যু এবং একশো মানুষ আহত হবে, তাকে বিপর্যয় বলা হবে (Basu, 2007)।

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Belgium বড় বিপর্যয়ের সংজ্ঞা দেন এইভাবে—

- (1) অন্তত 100 মানুষের মৃত্যু হবে,
- (2) দেশের জাতীয় GDP-এর এক শতাংশ বা তার বেশি পরিমাণে ক্ষতি হবে,
- (3) দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ বা তার বেশি আক্রান্ত হবে (Smith & Petley, 2007)।

## দুর্যোগের সৃষ্টি

পরিবেশে দুর্যোগ সাধারণত তিনভাবে ঘটতে পারে—

- (1) কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সংঘটিত দুর্যোগ (Natural Hazards)।
  - (2) প্রাকৃতিক শক্তি এবং মানুষের কার্যকলাপ উভয়েই যার জন্য দায়ী এমন দুর্যোগ (Quasi Natural Hazard)।
  - (3) কেবলমাত্র মানুষের অপরিণামদর্শিতার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ (Manmade Hazards)।
- ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি প্রভৃতি দুর্যোগ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক

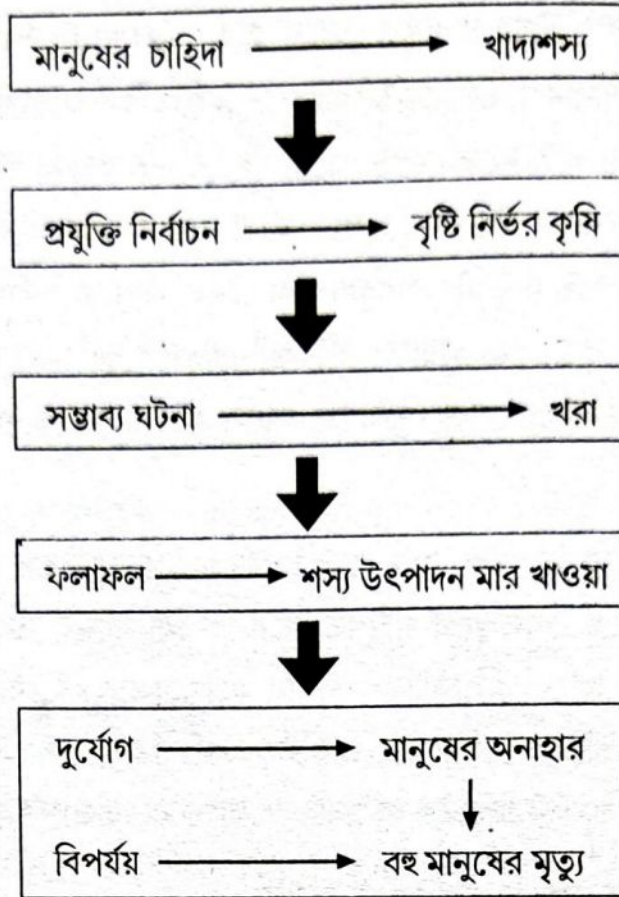
কারণেই সৃষ্টি হয়। এগুলির উপর মানুষের কোনো হাত নেই। মানুষ এদের কাছে অসহায়।

বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, দাবানল, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণেই হয়। কিন্তু মানুষের কার্যকলাপের ফলে নদীর খাত মজে যেতে পারে, বাঁধের জল ছাড়ায় গাফিলতি হতে পারে। এসব কারণে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক, আধা শুষ্ক অঞ্চলে এমনকি আর্দ্র অঞ্চলেও অবৈজ্ঞানিকভাবে জলসম্পদ ও ভূমির ব্যবহার খরা ডেকে আনতে পারে। দুর্ভিক্ষ, দাবানলের প্রসঙ্গে একই কথা বলা যায়। পার্বত্যচালে অবৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকার্য বা নগরায়ণের ফলে ভূমির ধস প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এগুলি আধাপ্রাকৃতিক দুর্যোগ (Quasi Natural Hazard)।

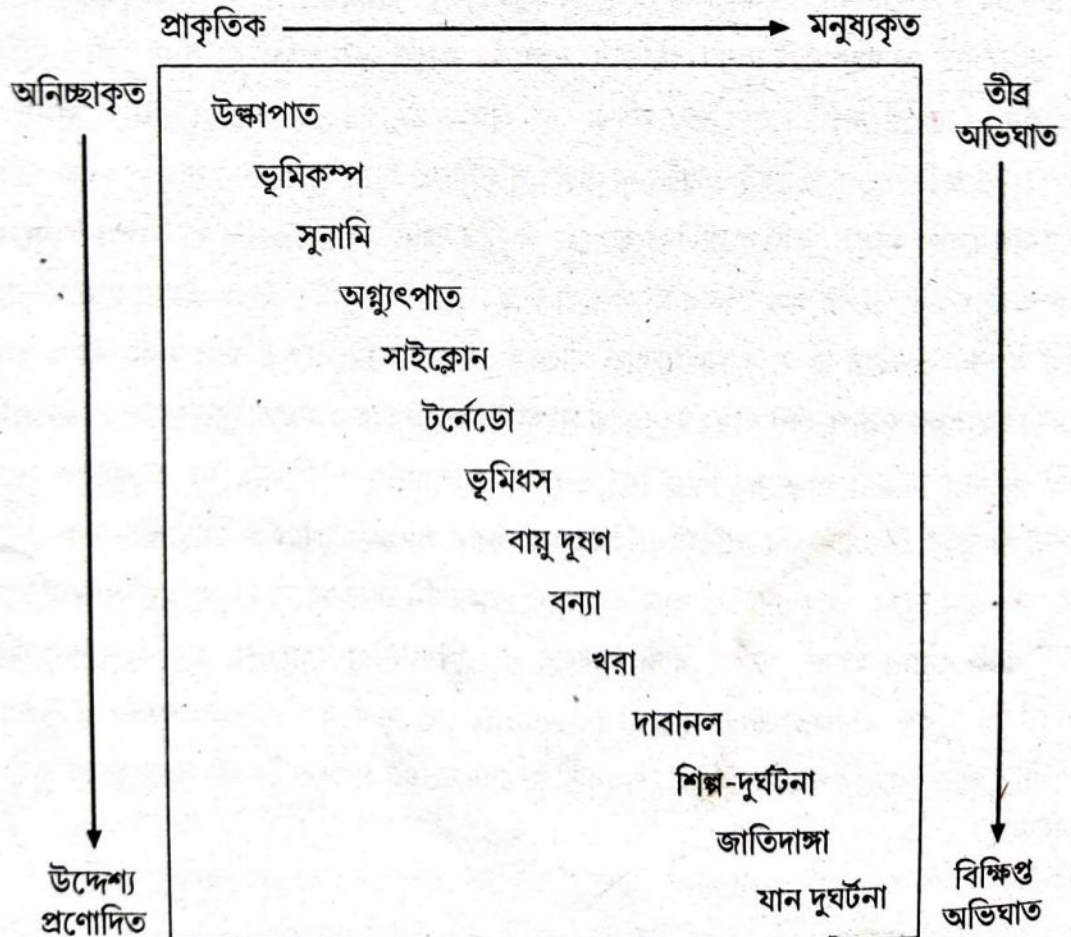
যদি কোনো অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রচুর সম্পদ ও জীবনহানি হয়, জঙ্গিগোষ্ঠী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোনো এলাকাকে ধ্বংসস্বূপে পরিণত করে, অথবা যুদ্ধের সময় বিরোধী এলাকায় বোমা, রকেট ইত্যাদির সাহায্যে এলাকাটিকে শাসন করে দেওয়া হয়, যদি বিবাক্ত রাসায়নিক বা মারণরোগের জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তবে সেখানে প্রকৃতির কোনো হাত থাকে না। এগুলিই হল মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ।

#### মানবসভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে দুর্যোগ সৃষ্টির সম্পর্ক :

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, মানবসভ্যতার জয়যাত্রা, মানুষের আর্থিক উন্নতি, এসবই পৃথিবীতে দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়িয়ে চলেছে। কারণ ভূমিকম্প বা বন্যা যদি জনহীন প্রান্তরে ঘটতো, তবে সেগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা বলে স্বীকৃত হতো। এই ধরনের ঘটনায় মানুষ বা তার সম্পদের ক্ষতি হলে, তবেই এগুলি দুর্যোগ। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আরও বেশি বেশি মানুষ ক্ষতির ঝুঁকির কবলে পড়ছে আর Vulnerable বা বিপন্ন মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও বাড়ছে। কারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়লে জনপ্রতি সম্পদ ব্যবহার ও খরচের মাত্রাও বাড়ছে। ফলে পরিবেশের মান সর্বত্র ধরে রাখা যাচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। মানুষের সংখ্যা ও তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার ফলে জনপ্রতি ও মোট খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু বিশ্বউষ্ণায়ন, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রসারের ফলে কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বিশ্বজুড়ে কমে যাচ্ছে। কাজেই অচিরেই এক দেশে খাদ্যের অকুলান হলে, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানি করা যাবে না, কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য থাকবে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমগ্রবিশ্ব খাদ্যসংকট বা Food insecurity তে ভুগবে। কাজেই সভ্যতার উন্নয়ন এবং দুর্যোগ হাত ধরাধরি করে চলেছে। পরবর্তী চিত্রটিতে এই সম্পর্কটিকেই সহজভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।



### দুর্যোগের শ্রেণীবিভাগ :



আগের পাতার চিত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, উল্কাপাত বা ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক, সেটা মানুষের অনিচ্ছাকৃত ও অভিঘাতও তীব্র। আবার ভূমিধস, বন্যা, খরা প্রভৃতি দুর্যোগে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃত কারণ দুই-ই দায়ী। আবার ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো শিল্প দুর্ঘটনা, জাতিদাঙ্গা বা যান দুর্ঘটনা ইত্যাদি দুর্যোগ একেবারেই মনুষ্যকৃত এবং কখনও কখনও দুই-ই মানুষের কু-উদ্দেশ্যেও এতে মিশে থাকে। এছাড়াও দুর্যোগের প্রভাব কার বা কিসের উপর পড়ছে তা বিচার করেও দুর্যোগের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন—

দুর্যোগের শ্রেণী	ফলাফল
1) মানুষের উপর আঘাতকারী	মৃত্যু, দৈহিক আঘাত, রোগের প্রাদুর্ভাব, মানসিক অশান্তি
2) জিনিসপত্রের উপর আঘাতকারী	সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি, আর্থিক ক্ষতি
3) পরিবেশের উপর আঘাতকারী	জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস, দূষণ, সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবার ক্ষতি

কোনো দুর্যোগ যখন ব্যাপকহারে প্রাণহানি ও সম্পদহানি ঘটায়, তখন সেটা বিপর্যয়ে পরিণত হয়। কোনো দুর্যোগ বিপর্যয়ে পরিণত হবে কিনা, সেটা দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় মানুষের বিপন্নতার মাত্রার উপর নির্ভর করে। বিপন্নতার মাত্রা আবার কয়েকটি উপাদানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

### বিপন্নতার মাত্রা নির্ধারক কারণ সমূহ :

দুর্যোগের ফলে মানুষের বিপন্নতা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন—

- (1) **দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা (Resilience) :** এই ক্ষমতা যার যত বেশি থাকবে, তার বিপন্নতাও তত কমবে। অনুন্নত দেশগুলিতে প্রতিবছরই, বন্যা, খরা, মহামারী প্রভৃতির সঙ্গে থাকতে থাকতে, মানুষের একটা সহ্যশক্তি তৈরি হয়ে যায়। আবার উন্নত বিশ্বের দেশগুলি খুব দ্রুত ভেঙে পড়া পরিষেবা ব্যবস্থা চালু করে, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে প্রচুর অর্থ খরচ করে দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে।
- (2) **পরিকাঠামোয় নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) :** উন্নত বিশ্বের বাড়িঘর মজবুত। দুর্যোগের আগাম আভাস দেওয়ার পরিকাঠামোও অনেকাংশে নিখুঁত। যেমন— জাপানে প্রচুর ভূমিকম্প হলেও সেদেশে ঘরবাড়ি ও অন্যান্য পরিকাঠামো এমনভাবে তৈরি যে, খুব একটা প্রভাব পড়ে না। কিন্তু অনুন্নত বিশ্বে এই সুবিধা পাওয়া যায় না, তাই বিপন্নতাও বেশি হয়।
- (3) **অর্থনৈতিক কারণ (Economic factors) :** অনুন্নত বিশ্বের দরিদ্র মানুষের হাতে

দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার মতো পুঁজি, জমি, অন্যান্য সম্পদ, যন্ত্রপাতি কিছুই থাকে না। সাধারণ জীবনেই তারা খাদ্য বা চিকিৎসা সংকটে ভোগে। কাজেই বলা যায় পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার অভাব অনুন্নত বিশ্বের মানুষের বিপন্নতা, উন্নত বিশ্বের মানুষের তুলনায় অনেক বাড়িয়ে দেয়।

(4) সামাজিক কারণ (Social factors) : বয়স ও লিঙ্গভেদে মানুষের বিপন্নতা বদলে যায়। সচরাচর শিশু বা নাবালক এবং বৃদ্ধদের বিপন্নতা সমর্থ মানুষের চেয়ে বেশি। আবার পুরুষদের তুলনায় নারীদের বিপন্নতা বেশি। কারণ শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের দৈহিক ক্ষমতা কম, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন কম। ফলে যেকোনো দুর্যোগে সমর্থ পুরুষদের তুলনায় এদের প্রাণহানি বা আঘাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

(5) রাজনৈতিক কারণ (Political factors) : অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা বাড়িয়ে দেয়। দেশের অভ্যন্তরে জাতিদাঙ্গা, সীমান্তে বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, শরণার্থী মানুষের বিপন্নতা বাড়িয়ে তোলে।

(6) সামগ্রিক পরিবেশের মানের অবনমন (Environmental degradation) : বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ, অরণ্য ছেদন, অতিরিক্ত কৃষি, বিশ্বউষ্ণায়ন, ওজোনস্তর ক্ষয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘনঘন খরা ও বন্যা ডেকে আনে। অস্বাভাবিক বর্ষা ভূমিধস, পাড় ভাঙন প্রভৃতি দুর্যোগকে বাড়িয়ে তোলে। এর ফলেও মানুষের বিপন্নতা বাড়ে।

আগের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে উন্নত বিশ্বের মানুষের থেকে অনুন্নত বিশ্বের মানুষের বিপন্নতা অনেক বেশি। এইসব দেশে জনসংখ্যাও বেশি, যেকোনো দুর্যোগে প্রচুর প্রাণহানি ও সম্পদহানির সম্ভাবনাও অনেক বেশি। তাই অনুন্নত বিশ্বে দুর্যোগগুলি প্রায়শই বিপর্যয়ে পরিণত হয়।

**দুর্যোগ মোকাবিলার উপায় বিষয়ে ধারণার ক্রমবিবর্তন :**

প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মনে করতো এবং অসহায়ভাবে প্রকৃতির রোষের কাছে আত্মসমর্পণ করতো। পূজো আচ্ছা করে প্রকৃতিকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হত। ধীরে ধীরে সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দুর্যোগ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলাতে থাকে।

**প্রযুক্তির সাহায্যে সমাধানের খোঁজ (Search for engineering solution) :** প্রায় 4000 বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ প্রথম নদীতে বাঁধ দেওয়া শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষকে দুর্যোগ মোকাবিলার পথে অনেকখানি

এগিয়ে দেয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার প্রযুক্তি আসার ফলে কোনো এলাকায় খরা ও বন্যা ঘটার আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রযুক্তিগত সমাধানকেই প্রাধান্য দেওয়া হত।

**আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধানের খোঁজ (Search for behavioural solution) :** বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে মানুষের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কার্যকলাপও যে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উস্কে দেয়, সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়। অনেকক্ষেত্রেই মানুষের আচরণ বদল করে, সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রকরণ বদল করে দুর্যোগ মোকাবিলার চেষ্টা শুরু হয়।

**টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সমাধানের খোঁজ (Search for solution in sustainable development) :** 1970-এর দশক থেকে বৈজ্ঞানিকরা ভাবতে শুরু করেন যে, উন্নয়নের বৈষম্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজি ও পরিকাঠামোর অভাব সহজেই দুর্যোগকে বিপর্যয়ে পরিণত করছে। কাজেই কোনো দেশে টেকসই উন্নয়ন দুর্যোগের সংঘটন ও ভয়াবহতাকে কমিয়ে দিতে পারে।

**সার্বিক সমাধানের খোঁজ (Search for a complex integrated solution) :** একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন যে, কোনো অনুন্নত এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে গেলে প্রযুক্তিগত সমাধানও যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বিষয়ে মানুষের আচরণেরও বদল দরকার। আবার সার্বিকভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে sustainable development বা টেকসই উন্নয়নও দরকার। তাই কোনো একভাবে সমাধানের চেষ্টা না করে সামগ্রিকভাবে সমাধান করাই শ্রেয়।

### দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করার উপায় :

দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রসংঘের প্রচেষ্টা :

- (1) কোনো দেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত, কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে সাহায্য করা— এইসব কাজের জন্য রাষ্ট্রসংঘ Disaster management team গঠন করে।
- (2) 1971 সালে বিপর্যস্ত অঞ্চলে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি হয় United Nation's Disaster Relief Co-ordinator। এদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার আবেদন করে 50 হাজার ডলার পর্যন্ত সাহায্য পেতে পারে।
- (3) বিশ্বস্ত অঞ্চলে উন্নয়ন ও বিপর্যয়ের প্রভাব নিবারণের জন্য অর্থ সাহায্য করে United Nations Development Programme.
- (4) কৃষি, পশু, পাখি ও মাছ উৎপাদকের পুনর্বাসনে পরামর্শ ও অর্থসাহায্য দেয় Food and Agriculture Organization (FAO)।

- (5) ত্রাণ, পুনর্গঠন, পুনর্বাসনে বার্ষিক প্রায় সাড়ে চার কোটি ডলার পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে World Food Programme (WFP)।
- (6) বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে দুর্গত মানুষ যখন অন্য অঞ্চলে, অন্য দেশে আশ্রয় নেন, তখন সেই শরণার্থীদের সুরক্ষার জন্য সাহায্য করে United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)।
- (7) বিপর্যয়ের প্রাকৃতিক উৎস, ঝুঁকির অনুমান ইত্যাদি গবেষণার কাজে যুক্ত হয় United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO)।
- (8) বিপর্যস্ত বা দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে উপযুক্ত বাসস্থান তৈরির বিষয়ে পরিকল্পনা, পরামর্শ ও আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করে United Nations Centre for Human Settlement (UNCHS) Habitat।
- (9) দুর্যোগ প্রবণ ও বিপর্যস্ত দেশে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে নজর রাখে, বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থব্যয় করে— United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)।

### দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যান্য সংস্থা

- (1) জাপানের কোবে শহরে আছে Asian Disaster Reduction Centre। এই সংস্থাটি এশিয়ার দুর্যোগগ্রস্ত দেশগুলিকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য করে।
- (2) এ ছাড়াও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবিলায় আরও দুটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হল— Asian Disaster Preparedness Centre (রাষ্ট্রসংঘের ভারপ্রাপ্ত সংগঠন) এবং Asia-Pacific Disaster Management Centre (ফিলিপিনসের ম্যানিলায়-এর সদর দপ্তর)।

### আন্তর্জাতিক সম্মেলন

1992 সালে ব্রাজিলের রিও-ডি জেনিরোতে যে বসুন্ধরা সম্মেলন বসে সেখানে একুশ শতকের উপযোগী একটি অঙ্গীকার তালিকা গ্রহণ করা হয়। সেখানে একটি ধারায় বলা হয়েছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্ত দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক সাহায্য দান অবশ্য কর্তব্য হবে।

এ ছাড়াও রাষ্ট্রসংঘের এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে 1994 সালের 23 মে থেকে 27 মে জাপানের ইয়াকোহামা শহরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবমুক্ত অধিকতর নিরাপদ বিশ্ব তৈরির জন্য অঙ্গীকার করা হয়। এবং

সেই সঙ্গে দুর্যোগগ্রস্ত অঞ্চলে দুর্গত মানুষের উন্নয়নে গাফিলতি ও বিশৃঙ্খলার কড়া সমালোচনা করা হয়।

## বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারত সরকারের ভূমিকা

ভারত এমনই একটি দেশ যেখানে, দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও মৃত্যু সাধারণ মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ব্যাপার। মহামারি থেকে খরা, বন্যা থেকে ঘূর্ণিঝড়, কিংবা ভূমিকম্প, ভূমিধস, এমনকি সুনামি কোনো দুর্যোগের হাত থেকেই এদেশের মুক্তি নেই। প্রতি বছর এইসব দুর্যোগের ফলে মৃত, আহত, রুগণ, পঙ্গু মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাতিদাঙ্গা, জঙ্গি নাশকতা এবং মারণ রোগের প্রাদুর্ভাব।

নথিপত্র থেকে জানা যায়, 1988 থেকে 1997 এই দশ বছরে 24 মিলিয়ন লোক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছেন এবং প্রতি বছর গড়ে 5,116 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। 1998 সালে বিভিন্ন দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় 3,41,12,566 এবং মৃত্যু হয় 9846 জন মানুষের। 1985 থেকে 1995 এই সময়ে বছরে গড়ে এই কারণে আর্থিক ক্ষতি হয় 1,883.93 মিলিয়ন US ডলার।

2002 সালের জুন মাসের পর থেকে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপর ন্যস্ত করেছে। তবে খরা মোকাবিলার ভার আছে কৃষিদপ্তরের উপর। 2004 সালে ভারত সরকার বিধ্বংসী সুনামি ঘটার পরে ভূমিকম্প ও সুনামির আগাম পূর্বাভাস ও নির্দেশ প্রচারের জন্য যন্ত্রপাতি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনো বিপদ ঘটে গেলে কেন্দ্র সরকারের কৃষি, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কর্মসংস্থান, পরিবেশ ও বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প, বিমান, রেল, পরমাণু গবেষণা, স্বরাষ্ট্র, মানবসম্পদ বিকাশ, জলসম্পদ, প্রতিরক্ষা, অর্থ, যোগাযোগ দপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে জরুরি সমন্বয়সাধন করা হয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকে তহবিল যেখান থেকে দ্রুত ত্রাণের জন্য খাদ্য, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামের অর্থ যোগান দেওয়া হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি মনে রেখেও বলা যায়, ভারতে দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা দুর্ঘটনা ঘটার পরে উদ্যোগী হয় (Reactive), কিন্তু ঘটার আগে প্রতিবিধানে গাফিলতি দেখায় (Not proactive)।

আন্তর্জাতিক স্তরে কিন্তু এখন দুর্ঘটনা ঘটার পরে মোকাবিলার থেকেও ঘটনা ঘটার আগে আগাম পূর্বাভাস ও প্রস্তুতির উপর অনেক বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমানে ভারতেও এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যেমন—



- (১) মানুষ ও সম্পদের উন্নয়ন।
- (২) বিপর্যস্ত ও বিপর্যয়প্রবণ অঞ্চলের সঠিক তথ্যসংগ্রহ ও মজুত রাখা এবং এই কাজে মহাকাশ দপ্তর, দূর অনুধাবন (Remote sensing) ব্যবস্থা এবং Geographic Information System-এর সাহায্য নেওয়া।
- (৩) জাতীয় স্তরে National Committee for Disaster Management নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।
- (৪) জনশিক্ষা বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপর্যয় মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- (৫) এই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন করা।
- (৬) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্যোগ এলে গ্রামস্তরে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতির আয়োজন সম্পূর্ণ করা।
- (৭) পেশাদারি প্রতিষ্ঠান যেমন সেনাবাহিনী, আবহাওয়া দপ্তর, পুলিশবাহিনী, পূর্তদপ্তর, দমকল বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, অসামরিক প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর। এগুলির মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান ও জরুরি সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং প্রত্যেকের কাজ, দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া।
- (৮) সঠিক তথ্য, সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার পরিকাঠামো তৈরি। এটাতে ব্যর্থ হলে, আংশিক সত্য ও গুজবের চাপে দুর্যোগগ্রস্ত মানুষের দুর্গতি বহুগুণ বেড়ে যায়। যেসব দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস পাওয়া যায়, সেইসব ক্ষেত্রে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা তৈরি রাখা।
- (৯) সরকারি স্তরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে মহড়ার ব্যবস্থা করা।
- (১০) খরা, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চলে ফসলের বিমার ব্যবস্থা করা।
- (১১) ভূপালের মতো রাসায়নিক বিপর্যয় যাতে না হয় সেজন্য শিল্প কারখানাগুলির দিকে কড়া নজর রাখা।

### প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেলে কী করা উচিত

- (১) অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, কর্তব্য, দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষকে সচেতন থাকতে হবে।
- (২) গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একসঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলার চেষ্টা করতে হবে।

- (3) বিপর্যয়ের ফলে মৃত্যু, অঙ্গহানি, পঙ্গুত্বের জন্য কর্মক্ষম মানুষ কমহীন হয়ে পড়ে। ফলে অতি দ্রুত পরিবারে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্তরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।
- (4) অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (5) শরণার্থী শিবিরে শিশু ও নারীরা পাচার ও স্ত্রীলতাহানির কবলে পড়ে, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- (6) বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যও বিপর্যস্ত হয়। চারিপাশে ধ্বংস ও শোকের আবহে মানসিক শূন্যতা ও অবসাদ সৃষ্টি হয়। এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সমাজকে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে।

### প্রশ্নাবলী

- 1। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাকে বলে? এর শ্রেণিবিভাগ করো।
- 2। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, বিশদে ব্যাখ্যা করো।
- 3। দুর্যোগ কাকে বলে? ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এবং সৃষ্টির কারণ অনুযায়ী এর শ্রেণিবিভাগ করো। উপযুক্ত উদাহরণ দাও।
- 4। বিঘ্ন ও বিপর্যয়ের তুলনা করো। উন্নয়নশীল বিশ্বে বিপর্যয় বেশি ঘটার কারণ কী?
- 5। দুর্যোগের মোকাবিলা কীভাবে করা যায় তা বিশদে ব্যাখ্যা করো।

### তথ্য আকর :

1. প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা— তারক ব্যানার্জী। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেল্থ অ্যাসোসিয়েশন।
2. India disasters report towards a policy initiative—edited by Parasuraman S. and Unnikrishnan P.V., Oxford, 2001.
3. Some Aspects of Natural Disaster Management, Prof. Dilip Kumar Sinha, Institute for Rural Development, Natural Disaster and Environmental Management (IRUDEN DEM), 2002.
4. Hazard Perception and Disaster Management, edited by Dr. Mridula Niyogi, Dr. Sriparna Bose, Dr. Bansari Guha, Ms. Bhaswati Ray, Sivanath Sastri College, Department of Geography, 2007.
5. Society Development and Environment, Prof. Sunil Kumar Munsu, Felicitation Volume, edited by Ranjan Basu, Sukla Bhaduri, Progressive Publishers, 2006.
6. Coping with Natural Hazards : Indian context, edited by K. S. Valdiya, Orient Longman, 2004.
7. Smith, Keith and Petley, David N. (2009) : Environmental Hazards, Assessing risk and reducing disaster, Fifth edition, Routledge, London and New York.

(d) ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রাবল্যতা (Magnitude of earthquake wave)

(e) ভূকম্পীয় তরঙ্গের গড় ত্বরণ (Average acceleration of earthquake wave) প্রভৃতি।

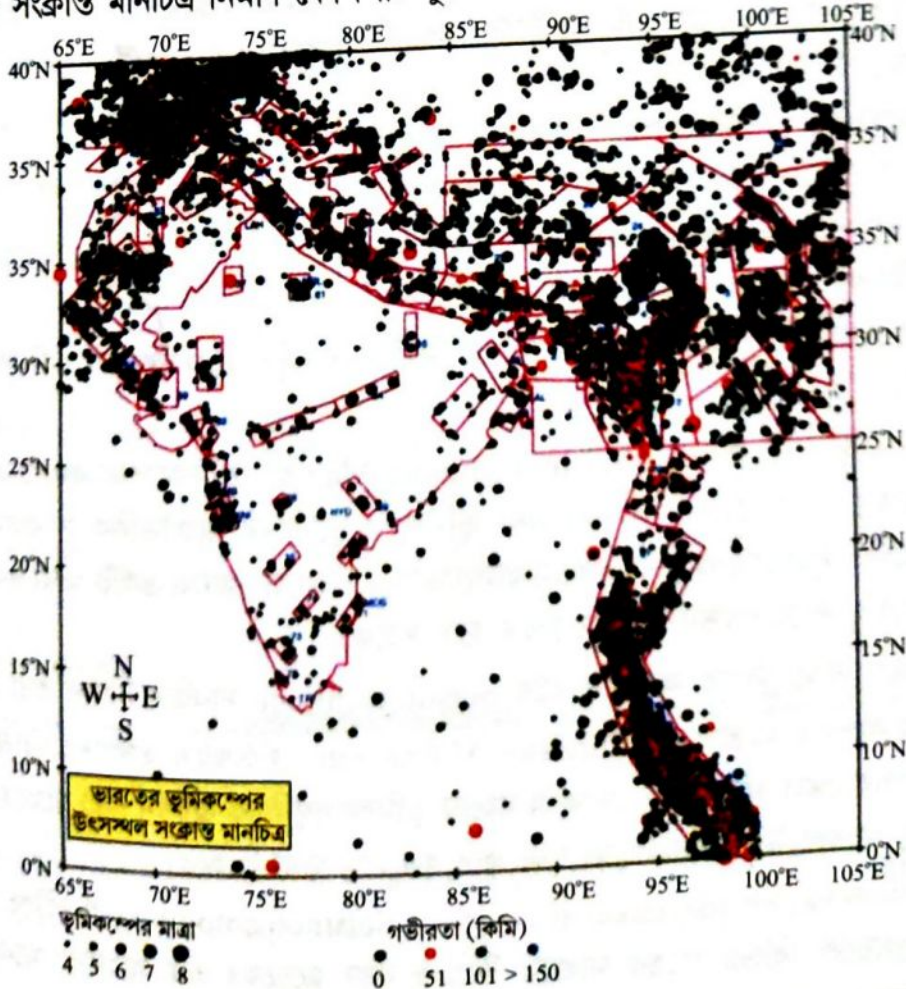
➤ **মানচিত্র নির্মাণ (Map Construction)** : ভূমিকম্পের মানচিত্র নির্মাণে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, যা "Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP)" নামে পরিচিত। McGuire-এর "Peak Ground Accelerations (PGA)" পরিমাপক পদ্ধতিতে 'FRISK88M Software'-কে আদর্শভাবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিটি ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলির মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

1996 সালের পর থেকে হায়দ্রাবাদে অবস্থিত "National Geo Physical Research Institute (NGRI)" ভারতের ভূমিকম্পের বিভিন্ন উৎসস্থল এবং ভূমিকম্পের বিভিন্ন তীব্রতা অঞ্চলের মানচিত্রগুলিকে দায়িত্বসহকারে প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 'NOAA Catalogue'-এ ভারতের  $0^{\circ}$ - $40^{\circ}$  N এবং  $65^{\circ}$ - $100^{\circ}$  E পরিসরে ভূমিকম্পের মানচিত্রগুলি নির্মাণ করা হয়। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পের মানচিত্র নির্মাণের কৌশল উপস্থাপন করা হল।

**1. Seismicity and Source Zonation Map** : ভূকম্পীয় উৎস সংক্রান্ত আঞ্চলিক মানচিত্রটি মূলত কোনো অঞ্চলের ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রকৃত গতিবিধি অনুধাবন করেই নির্মাণ করা হয়।

▪ **কৌশল (Techniques)** : এই ধরনের মানচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যে কৌশলগুলি অবলম্বন করতে হয়, তা হল—

- (i) **অনুশীলনক্ষেত্র (Study Area)** : মানচিত্র নির্মাণের জন্য প্রথমেই অতীতে একাধিকবার ভূমিকম্প ঘটেছে এরকম একটি স্থানকে অনুশীলনক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করা হয়।
- (ii) **পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Observation Centre)** : এরপর, ভূমিকম্পের বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থির করা হয়। এখানে ভূমিকম্পের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে চ্যুতি অঞ্চল বা বিভিন্ন পাতসীমানা (Plate boundary)-কে অবলম্বন করে স্থির করা হয়।
- (iii) **তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)** : এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্প এবং তার উৎসস্থলের গভীরতা সংক্রান্ত তথ্যগুলিকে দীর্ঘকাল ধরে নিবন্ধিকরণ করা হয়। এখানে যে সমস্ত তথ্যগুলি বিশেষ প্রাধান্য পায়, সেগুলি হল—
- ভূমিকম্পের উৎসস্থলের অবস্থান তথা ভূমিকম্পের কেন্দ্র।
  - ভূমিকম্পের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তরঙ্গের পরিধি।
  - ভূমিকম্পে প্রভাবিত সামগ্রিক অঞ্চল।
  - সক্রিয় চ্যুতি অঞ্চল।
  - ভূগাঠনিক পাতের গতিবিধি।
  - সমভূকম্পন অঞ্চল প্রভৃতি।
- (iv) **সংকলন (Compilation)** : ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করে এরপর মানচিত্র সংকলন করা হয়। প্রসঙ্গত, ভারতের ভূতাত্ত্বিক গঠনকে প্রাধান্য দিয়ে 1984 খ্রিস্টাব্দে Khattri যে 'Seismicity and Source Zonation Map' নির্মাণ করেছিলেন, তার ভিত্তিতে এখানে ভূমিকম্প সংক্রান্ত মানচিত্র নির্মাণ কৌশলটি তুলে ধরা হল।



চিত্র 5.2 : ভূমিকম্পের উৎসস্থল সংক্রান্ত মানচিত্র (Khattri প্রদত্ত)

- (a) ভূমিকম্পের উৎসস্থল সংক্রান্ত মানচিত্র নির্মাণের জন্য ভারতের যে অঞ্চলটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তার হল  $0^\circ$  থেকে  $40^\circ$  উত্তর অক্ষরেখা এবং  $65^\circ$  পূর্ব থেকে  $105^\circ$  পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা।
- (b) এরপর নির্ধারিত একটি বিশেষ ক্যাটালগে ভারতের চ্যুতিরেখা অঞ্চলগুলিকে অধ্যারোপ (Superimposed) করা হয়েছে।
- (c) সংশ্লিষ্ট চ্যুতিরেখা অঞ্চল বরাবর অতীতে বিভিন্ন সময়ে ঘটা ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পের উৎসস্থল অনুসারে এখানে 1-86 টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- (d) এরপর ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রীয় স্থলগুলিকে ভূমিকম্পের মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কালো রঙের ছোটো, মাঝারি কিংবা বড়ো অসংখ্য বিন্দু আকারে সংশ্লিষ্ট ক্যাটালগে প্রতিস্থাপিত করা হয়।
- (e) সমগ্র মানচিত্রটিতে বিভিন্ন রঙের বিন্দু দ্বারা ভূমিকম্পের গভীরতা কতটা তা উপস্থাপন করা হয়েছে।
- (f) এছাড়াও, ভূমিকম্পের উৎস সংক্রান্ত মানচিত্রটিতে ভারতের বিভিন্ন ভূমিকম্প প্রবণ শহরগুলিকে উপস্থাপন করার জন্য ইংরাজির বর্ণমালার একাধিক অক্ষরকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

উপাদান	বিভিন্ন প্রকৃতি	নির্দেশক
ভূমিকম্পের মাত্রা	অতি মৃদু	•
	মৃদু	•
	শক্তিশালী	•
	অতি শক্তিশালী	•
	অত্যন্ত শক্তিশালী	•
ভূমিকম্পের গভীরতা	অতি স্বল্প গভীর	কালো বর্ণ
	স্বল্প গভীর	লাল বর্ণ
	মধ্যম গভীর	সবুজ বর্ণ
	অতি গভীর	নীল বর্ণ
ভূমিকম্প প্রবণ শহরের নাম	BUJ	ভূজ
	CAL	কোলকাতা
	HYD	হায়দ্রাবাদ
	JBL	জব্বলপুর
	SRI	শ্রীনগর
	NDL	নতুন দিল্লি
	LAH	লাটুর
	MDS	মাদ্রাজ
PBL	পোর্টব্লেয়ার	

প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পের উৎসস্থল সংক্রান্ত মানচিত্র নির্মাণে ব্যবহৃত নির্দেশকগুলি উলিখিত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

**2. Seismotectonic Map :** Seismotectonic Map হল ভূমিকম্পের এমনই এক বিশেষ ধরনের মানচিত্র, যেখানে ভূতত্ত্ব, ভূ-প্রাকৃতিক সংস্থান এবং ভূমিকম্প দুর্যোগের মাত্রাভিত্তিক সংকলনগুলি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তা ছাড়া এই মানচিত্রে আধুনিক পাতসঞ্চালন তত্ত্বের সাহায্যে কোনও একটি অঞ্চলের গাঠনিক পরিসরে ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

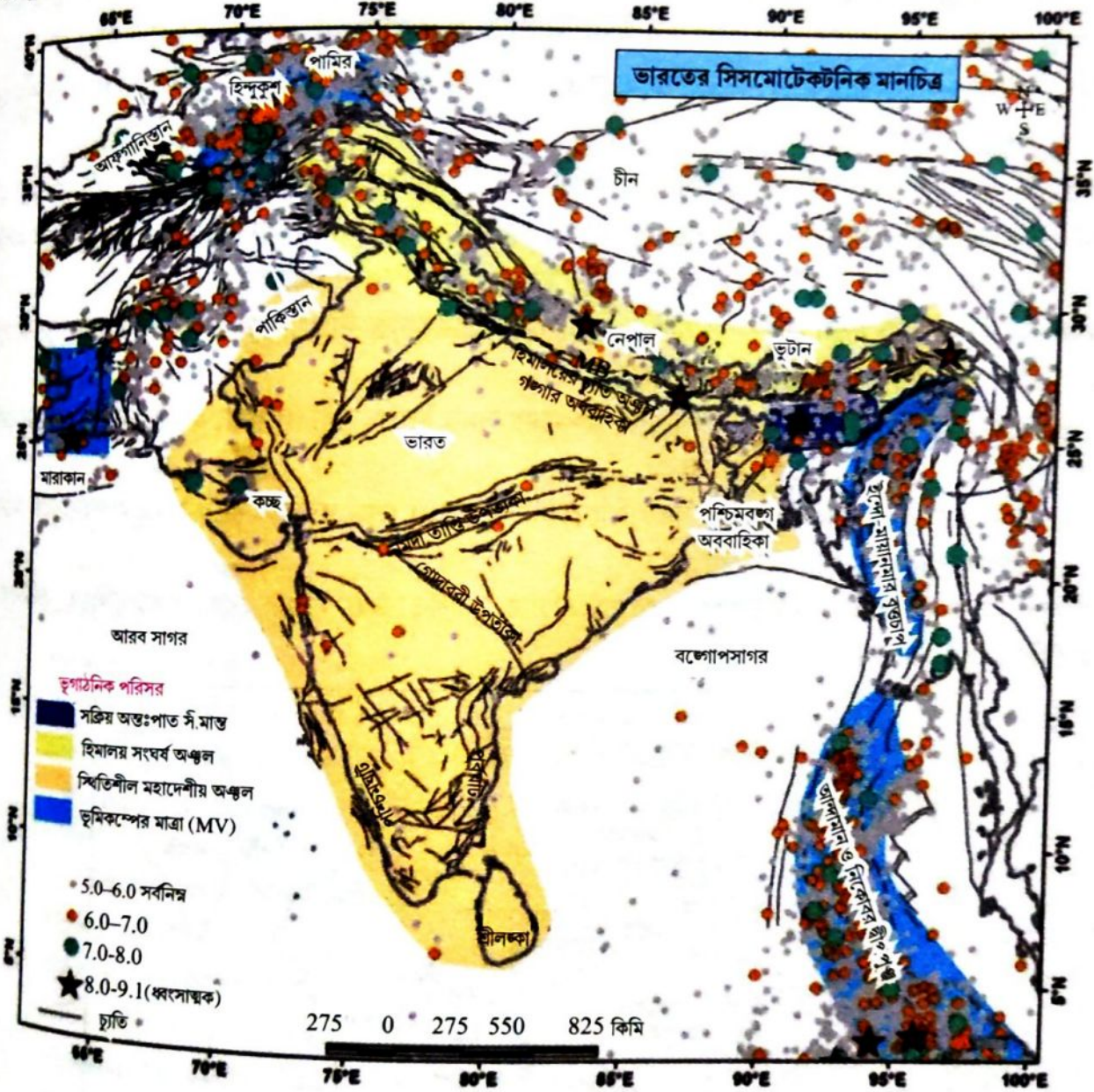
প্রসঙ্গত, যে সমস্ত বিষয়গুলিকে অধ্যয়ন করে Seismotectonic মানচিত্র নির্মাণ করা হয়, তা হল—

- (a) **ভূমিকম্পের মাত্রা (Earthquake Magnitude) :** এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত রিখটার স্কেল অনুযায়ী 5 থেকে 8 মাত্রার ভূমিকম্পগুলিকে প্রদর্শন করা হয়েছে। মানচিত্রে প্রতিটি ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত (○) দ্বারা চিহ্নিত।
- (b) **গাঠনিক পরিসর (Structural range) :** Seismotectonic মানচিত্রটিতে ভূগাঠনিক প্রতিটি পরিসরকে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর সাহায্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের গাঠনিক ঝুঁকিগুলিকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়।

(c) **ভূতাত্ত্বিক গঠন (Geological Structure)** : সংশ্লিষ্ট মানচিত্রে যে সমস্ত ভূতাত্ত্বিক গঠনগুলিকে প্রদর্শন করা হয়েছে, সেগুলি হল—(a) চ্যুতি (Fault), (b) উপপৃষ্ঠীয় চ্যুতি (Sub Surface Fault), (c) স্বাভাবিক চ্যুতি (Normal Fault), (d) নব্যভূগাঠনিক চ্যুতি (Neotectonic Fault), (e) বিখণ্ডিত অঞ্চল (Shear Zone), (f) থ্রাস্ট ও সন্ধি অঞ্চল (Thrust and Suture Zone), (g) সক্রিয় অন্তঃপাত সীমান্ত (Active subduction boundary) প্রভৃতি।

এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মানচিত্রটিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক শহর এবং রাজ্যভিত্তিক সীমানা বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

\* **কৌশল (Techniques)** : Seismotectonic Map নির্মাণ কৌশলটি অনেকটা BMTPC প্রদত্ত Earthquake Hazard Map নির্মাণের কৌশলের মতো।



চিত্র 5.3 : ভূমিকম্পের Seismotectonic মানচিত্র

প্রথমত, ভারতের নির্দিষ্ট সীমানাভিত্তিক অঞ্চলকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যার সামগ্রিক বিস্তৃতি  $5^\circ$  উত্তর থেকে  $40^\circ$  উত্তর অক্ষাংশ এবং  $65^\circ$  ডিগ্রি পূর্ব থেকে  $100^\circ$  পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, এরপর ভূগাঠনিক দিক থেকে চ্যুতি অঞ্চল, সক্রিয় অন্তঃপাত সীমান্ত, সংঘর্ষ অঞ্চল, স্থিতিশীল অঞ্চলগুলিকে ভূমিকম্পের ভিত্তিতে নিপুণভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এরপর সংশ্লিষ্ট অঞ্চল জুড়ে ঘটা অতীতের বিভিন্ন সময়ের অনুভবযোগ্য ভূমিকম্পের বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী তার উৎসস্থলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে মানচিত্রটিতে ★ চিহ্ন দ্বারা সর্বোচ্চ মাত্রা বিশিষ্ট ভূমিকম্পের উৎসস্থলগুলি প্রদর্শিত হয়েছে।

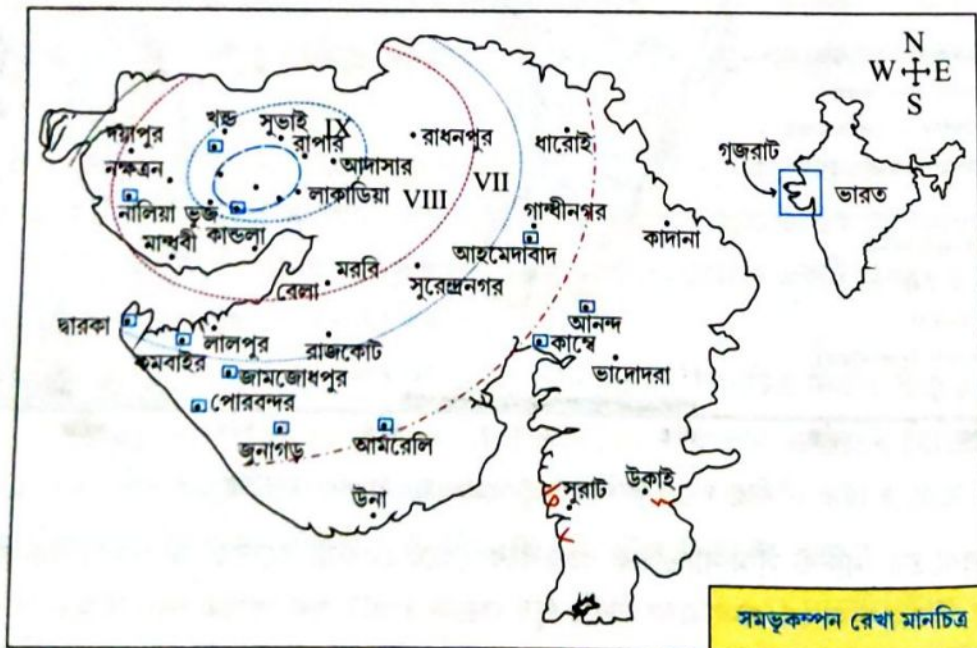
**3. Isoseismal Line Map :** ভূপৃষ্ঠের কোনও অঞ্চলে সমান ভূকম্প তীব্রতার স্থানগুলিকে কোনো কাল্পনিক রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হলে, তাকে সমতীর ভূকম্পন রেখা বলা হয়। আর, যে বিশেষ মানচিত্রে এই সমতীর ভূকম্পীয় স্থানগুলিকে উপস্থাপন করা হয়, তাকেই **Isoseismal Line Map** বলা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, হাঙ্গেরিতে 1810 খ্রিস্টাব্দে ভূবিজ্ঞানী Mor কর্তৃক পৃথিবীতে প্রথম Isoseismal Line Map তৈরি করার প্রচেষ্টা শুরু হলেও, তা সফলভাবে প্রকাশিত হয় 1857 খ্রিস্টাব্দে Robert Mallet-এর প্রচেষ্টায়।

■ **কৌশল (Techniques) :** সাধারণত কোনো স্থানে ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার ঠিক পরেই ভূমিকম্পের Isoseismal Line Map তৈরি করা হয়। এর জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে হয়। **যেমন—**

- কোনো স্থানে ভূমিকম্প ঘটার পর সেখান থেকে ভূমিকম্পের মাত্রাগত বন্টন সম্পর্কে বিশদ তথ্য আহরণ করতে হয়।
- বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সারণিতে সাজিয়ে তার যথার্থতা বিচার করা হয়।
- এরপর Mercalli কিংবা Richter Scale-এ পাওয়া ভূমিকম্পের সমান তীব্রতার মাত্রাগুলিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানচিত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিন্দুর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হয়।
- এরপর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পদ্ধতির দ্বারা সমান তীব্রতায়ুক্ত বিন্দুগুলিকে ঘিরে কয়েকটি পৃথক পৃথক প্রায় বৃত্তচাপীয় রেখা অঙ্কন করা হয়।
- প্রতিটি ভূকম্পীয় সমতীরতা রেখাগুলি অঙ্কনের সময় বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়, যাতে কোনো রেখাই যেন একে অপরকে ছেদ না করে।
- সবশেষে পৃথক পৃথক মাত্রার রেখাগুলিতে নির্দিষ্ট রঙের শেড ব্যবহার করে সমভূকম্পনরেখা মানচিত্র উপস্থাপন করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট সমভূকম্পন রেখামানচিত্রে প্রদর্শিত উচ্চ মাত্রার রেখা বলয়গুলিতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি সর্বাধিক হয়ে থাকে।



চিত্র 5.4 : গুজরাটের সমভূকম্পন রেখা মানচিত্র

#### 4. Earthquake Belt Map or Earthquake Prone Area Map : কোনো স্থানে ভূমিকম্প

প্রবণতার প্রকৃতি কীরূপ তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে Seismic Zone Map বা Earthquake Belt Map নির্মাণ করা হয়।

✱ কৌশল (Techniques) : Seismic Zone Map বা Earthquake Belt Map প্রস্তুতের জন্য যে কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়, তা হল—

- প্রথমেই ভূমিকম্পপ্রবণ নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল নির্ধারণ করতে হয়। এখানে সংশ্লিষ্ট মানচিত্র অঙ্কনে ভারতের যে নির্দিষ্ট পরিসরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার সামগ্রিক বিস্তৃতি হল 8° উত্তর থেকে 38° উত্তর অক্ষাংশ এবং 68° পূর্ব থেকে 100° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত।
- এরপর বিগত কয়েক দশকের মধ্যে ভারতে মোট যতগুলি ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রত্যেকটির উৎসস্থল এবং মাত্রা (Magnitude) সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এখানে BIS কর্তৃক 1883 খ্রিস্টাব্দ থেকে 2002 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ভূমিকম্পের অবস্থান এবং মাত্রা সংকলন করা হয়েছে।
- ভূমিকম্পের বলয় মানচিত্র নির্মাণ করার জন্য কোনও একটি অঞ্চলকে নির্দিষ্ট অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ ভিত্তিক অসংখ্য গ্রিডে বিভক্ত করা হয়। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি গ্রিডের একক ক্ষেত্রফল যত ছোটো হবে, ততই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিটি ভূমিকম্পের উৎসস্থল গুলিকে লিপিবদ্ধ করা যাবে। আবার গ্রিডের ক্ষেত্রফল যদি খুব বড়ো হয়ে যায়, তাহলে ভূমিকম্পের উৎসস্থল গুলির অবস্থান প্রদর্শনে কিছুটা ত্রুটি আসতে পারে। সেক্ষেত্রে সমগ্র মানচিত্র প্রদর্শনে সাধারণিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- এখানে বছরের বিভিন্ন সময় উৎপন্ন প্রতিটি ভূমিকম্পের মধ্যে সর্বোচ্চ মানগুলিকেই একক হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যা ওই বছরটির ভূমিকম্পের 'Standard Maximum Observed Magnitude'-কে প্রতিনিধিত্ব করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি ভারতের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বিগত 119 বছরে পৃথক পৃথকভাবে মোট যতগুলি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রতি বছরের সর্বোচ্চ ভূমিকম্পের মাত্রাটিকেই এখানে প্রতিনিধিত্বকারী রূপে ধরা হয়।
- এরপর গ্রিডভিত্তিক বিভিন্ন বছরে মোট কতকগুলি অনুভবযোগ্য বা সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প ঘটল, তাকে পরিসংখ্যায়িত করতে হবে বা গুনতে হবে।

প্রসঙ্গত, ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেহেতু ভূমিকম্পের সমস্ত তথ্যগুলি স্থান-কাল অনুযায়ী প্রতি মিনিট, ঘণ্টা কিংবা দিন অনুযায়ী যে-কোনো সময়ই পরিবর্তিত হতে পারে, তাই এখানে গ্রিডভিত্তিক ভূমিকম্পের মাত্রা প্রদর্শনে বেশ কতকগুলি জটিল গাণিতিক কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয়। এগুলি হল—(a) Time Series Analysis, (b) Seismic Zone Factors, (c) Basic Seismic Coefficient, (d) Average Acceleration Coefficient, (e) Earthquake Energy Intensity, (f) Regression Relation প্রভৃতি।

- প্রসঙ্গত, ভূমিকম্পের মানচিত্রে উপকেন্দ্রগুলি প্রদর্শনে আমরা যদি দ্বিচলক রাশি ভিত্তিক Time Series Analysis Method-এর সাহায্য নিই, এখানে যে দুটি বিশেষ চলক (Variable) পাওয়া যাবে (যেমন—নির্দিষ্ট বছর এবং বছরভিত্তিক ভূমিকম্পের সর্বোচ্চ মাত্রা), তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে Least Square Method বা লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। এক্ষেত্রে a এবং b নামক দুটি ধ্রুবক সংখ্যা যে সমীকরণের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, তা হল— $\sum y = Na + b\sum x$ ,  $\sum xy = a\sum x + b\sum x^2$ । এখানে সংশ্লিষ্ট

#### □ সারণি-1 □

MM Scale-এ তীব্রতার প্রকৃতি	ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল
<V	Zone I
VI	Zone II
VII	Zone III
VIII	Zone IV
IX	Zone V

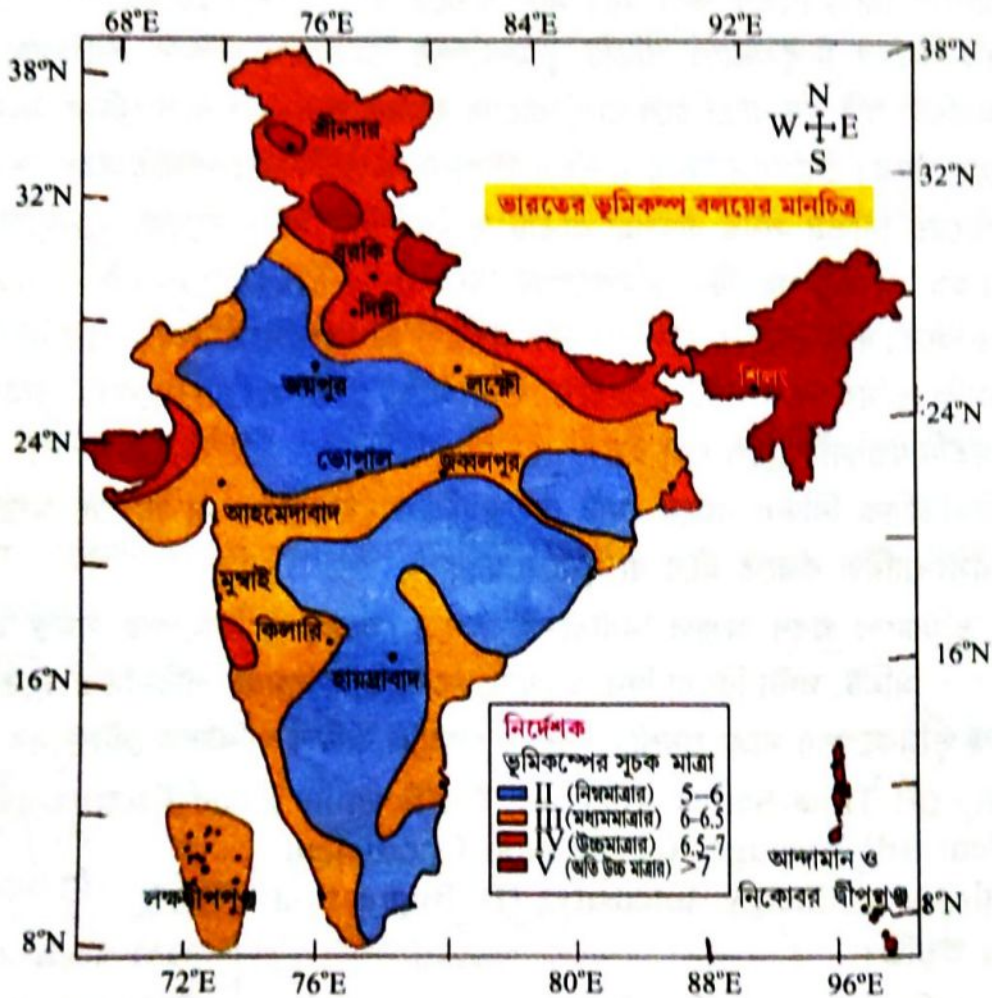


সমীকরণের মাধ্যমে পাওয়া  $b$  মানটি হল Time series method-এর 'Regression Relation'-এ পাওয়া  $M1$  বা 'Maximum Observed Magnitude' যা কোনো নির্দিষ্ট গ্রিডে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের সর্বোচ্চ মান।

(vii) এইভাবে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে পাওয়া সর্বোচ্চ intensity মাত্রার গড় মানগুলিকে বিভিন্ন গ্রিডে উপস্থাপন করার পর, প্রতিটি গ্রিডের মানের উপর নির্দিষ্ট ক্রমের 'Isopleth' অঙ্কন করলেই এক-একটি 'Earthquake Zone' পাওয়া যাবে।

(viii) সবশেষে "Earthquake Zone Map"-টিকে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রতিটি 'Index zone'-কে "Shed" কিংবা রঙ প্রয়োগ করা হয়। 'Bureau of Indian Standard' ভারতের ক্ষেত্রে যে ভূমিকম্পপ্রবণ বলয় মানচিত্র প্রকাশ করে থাকে, সেখানে 'Modified Mercalli Scale (MM-Scale)'-এর ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভিন্ন তীব্রতার অঞ্চল প্রদর্শন করে থাকে।

অবশ্য 2002 সালে ভারতের ভূমিকম্পের মানচিত্রে I এবং II নং zone-কে একত্রিত (Merge) করে মোট 4টি zone চিহ্নিত করা হয়েছে।



চিত্র 5.5 : ভারতের ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের মানচিত্র

# প্রাকৃতিক দুর্যোগ :

## শ্রেণিবিভাগ, মোকাবিলাত উপায়

(Natural Hazard : Classification, measures for mitigation)

# 1

মানুষের সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছর পেরিয়ে এলেও প্রকৃতি-নির্ভরতাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেনি, অথবা প্রকৃতির অপার বৈচিত্র্য ও গভীরতাকে মানুষ সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতেও পারেনি। তাই মাঝেমাঝেই ভয়ংকর বন্যা, খরা, ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, প্রভৃতির প্রকোপে মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইসব ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আকস্মিক এবং দ্রুত প্রভাববিস্তারকারী, তাই সঠিক পূর্বাভাস বা উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অনেকক্ষেত্রেই মানুষের বিভিন্ন তথাকথিত উন্নয়নমূলক বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, প্রকৃতিকে বশ মানানোর নানা প্রচেষ্টা এবং দূষণ এই ধরনের দুর্যোগকে ত্বরান্বিত করে।

দুর্যোগকে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

- (1) কোনো বিপদের ঝুঁকি (Risk),
- (2) বিঘ্ন (Hazard)
- (3) ভয়ংকর বিপর্যয় (Disaster)

ধরা যাক, নদীর পাড়ে ভাঙন চলছে, গ্রামের মানুষের নদী-পাড়ের জমি একটু একটু করে নদী গ্রাস করে নিচ্ছে, যে-কোনো দিন পুরো গ্রামটিই ভেঙে নদীর গর্ভে চলে যেতে পারে, কিন্তু এখনও যায়নি। সরকারি/বেসরকারি উপায়ে প্রতি বছর দায়সারাভাবে পাড় বাঁধানোর চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে সেই গ্রামের মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ আসন্ন বিপদের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

যদি ভূমিকম্প বা ভূমিধস ইত্যাদি ঘটার ফলে কোনো স্থানে আকস্মিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং সম্পদের অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে এলাকাটি বিঘ্ন (Hazard) পীড়িত বলতে হবে।

আবার যদি কোনো আকস্মিক টর্নেডো, সাইক্লোন বা সুনামি ঘটার ফলে অতি অল্পসময়ে বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে, অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে সেই ধরনের দুর্যোগকে ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা প্রলয় (disaster) বলা হয়।

প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও উদ্যোগের অভাব, সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব, ধর্মভীরুতা ও নিয়তি-নির্ভর নিশ্চেষ্টতা, দুর্যোগ মোকাবিলায় যথেষ্ট শক্তি ও সম্পদের যোগানের অভাব— ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষের বিপন্নতা বা vulnerability বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ আসন্ন বিপদকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বিপন্ন মানুষের সংখ্যা এবং অবৈজ্ঞানিকভাবে রক্ষিত সম্পদের পরিমাণ যত বেশি হবে বিপদের ঝুঁকিও ততই বাড়বে। এরপর বিপদ ঘটে গেলে অনেকক্ষেত্রে পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বিঘ্নের সীমা ছাড়িয়ে বিপর্যয়ে পরিণত হয়। উন্নয়নশীল বিশ্বে, অপরিবর্তিত উন্নয়ন, প্রচুর জনসংখ্যা, জীবনযাত্রার নিম্নমান, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অত্যাবশ্যিকীয় পরিসেবার ও জীবনদায়ী চিকিৎসার অপ্রতুলতা সহজেই জীবন ও সম্পদহানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং পৃথিবীর দুর্যোগপূর্ণ ঘটনার পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায়, বিপর্যয়ের সংখ্যা, মাত্রা সবকিছুই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেশি ঘটেছে। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বে দুর্যোগ মোকাবিলার উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা থাকায়, খুব কম দুর্যোগই বিপর্যয়ে পরিণত হয়। দুর্যোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে 1970 থেকে 1995-এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশের 123 মিলিয়ন মানুষ এবং আফ্রিকার 12 মিলিয়ন মানুষ ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে।

গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে গেলে বলা যায় যে, বিঘ্ন (hazard) এবং বিপর্যয় (disaster)-এর মধ্যে সীমারেখা টানা সহজ নয়।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীলকুমার মুন্সীর (2007) মতে— 'Though our mega environment has been more or less stable, minor deviations from this normal state cause deviation in human adaptation. Such deviations in nature beyond normal expectation is generally called hazard.'

ভূমিরূপবিদ অধ্যাপক সাবিন্দ্র সিং (2001) -এর মতে— 'Hazards are generally taken to be the processes, (causal factor) and the responses (Results) of extreme events, both natural and anthropogenic, which cause an accident/extreme events/or danger.'

অল্প কথায় বিঘ্ন বা hazard-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(1) পরিবেশের সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুতি যদি মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত করে তবে তা হল বিঘ্ন বা hazard।

ছাত্রছাত্রীরা মনে রাখবে বিঘ্ন বা hazard শুধু যে মানুষের জীবনকেই প্রভাবিত করবে তা নাও হতে পারে, জীবজন্তু, গাছপালা, কীটপতঙ্গ—সংক্ষেপে জীবজগতের যে-কোনো অংশই বিঘ্নের ফলে বিপদে পড়তে পারে। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে ও বায়ুমণ্ডলে ঝড়ঝঞ্ঝা চলতে পারে। কিন্তু সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। তাই সেই ঘটনাগুলি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনার রকমফের। বস্তুত, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলেই স্বাভাবিক পরিবেশের যে-কোনো বিচ্যুতি প্রাণ বা প্রোটোপ্লাজমকে বিপদের সামনে দাঁড় করাতে পারে। তাই পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই ধরনের বিচ্যুতি বিঘ্ন বা hazard রূপে গণ্য হবে।

(2) বিঘ্ন বা hazard-এর উৎপত্তি এবং প্রভাবিত এলাকা, বিপর্যয়ের তুলনায়, অল্প আয়তন অধিকার করে। সুতরাং, বিপর্যয় বা disaster-এর তুলনায় hazard ক্ষুদ্র স্কেলে সংঘটিত হয়।

(3) যে-কোনো বিঘ্ন বা hazard-এর জন্য নানারকম প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদান পৃথকভাবে বা সংযুক্তভাবে দায়ী হতে পারে। সুতরাং এধরনের ঘটনা ঘটার পর প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক দু'ধরনের সম্পদই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এবারে দেখা যাক, দেশবিদেশের নানা বিশেষজ্ঞ বিপর্যয় বা disaster-কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

(a) ফ্রেডরিক ক্রিমগোল্ড (Fredrick Krimgold) 1976 সালে, তাঁর 'Overview of the priority area Natural Disaster' (United Nations, New York) বইতে বিপর্যয়ের সংজ্ঞা দেন এইভাবে— 'Disaster is a crisis event which outstrips the capacity of society to manage or cope with it at least for a time.'

(b) 1989 সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়— 'Disaster is an extraordinary event of limited duration or strictly speaking, a natural event causing serious disruption of country's economy.'

(c) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে— 'a disaster is any occurrence causing damage, ecological disruption, loss of human lives, deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant any extraordinary intervention from outside the affected community (Ref. Lazzari Stefano, 1990, Health aspects of disaster preparedness and response, WHO Health for all when a disaster

strikes, Vol. 2).

সহজ কথায় বিপর্যয় বা disaster-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- (a) বিপর্যয় আকস্মিক ও দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী।
- (b) বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদহানি ও বিপুল সংখ্যার মানুষের জীবনহানি হয়। তবে সম্পদ ও জীবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ সহজ নয়। বিভিন্ন সময়, পরিস্থিতি ও দেশভেদে এই পরিমাপের পার্থক্য হয়। 2001 সালের World Disaster Report-এ বলা হয়— কোনো দুর্ঘটনা তখনই বিপর্যয় বলে গণ্য হবে যখন—
  - (1) দশ বা তার বেশি মানুষের মৃত্যু হবে।
  - (2) একশো বা তার বেশি মানুষ আহত হবে।
  - (3) পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সাহায্যের দরকার হবে।
  - (4) সরকারিভাবে আপৎকালীন পরিস্থিতি ঘোষিত হবে।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা (Natural Hazard Research Group) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে— কোনো দুর্ঘটনায় কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ হানি, অন্তত একশো মানুষের মৃত্যু এবং একশো মানুষ আহত হবে, তাকে বিপর্যয় বলা হবে (Basu, 2007)।

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Belgium বড় বিপর্যয়ের সংজ্ঞা দেন এইভাবে—

- (1) অন্তত 100 মানুষের মৃত্যু হবে,
- (2) দেশের জাতীয় GDP-এর এক শতাংশ বা তার বেশি পরিমাণে ক্ষতি হবে,
- (3) দেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ বা তার বেশি আক্রান্ত হবে (Smith & Petley, 2007)।

## দুর্যোগের সৃষ্টি

পরিবেশে দুর্যোগ সাধারণত তিনভাবে ঘটতে পারে—

- (1) কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সংঘটিত দুর্যোগ (Natural Hazards)।
  - (2) প্রাকৃতিক শক্তি এবং মানুষের কার্যকলাপ উভয়েই যার জন্য দায়ী এমন দুর্যোগ (Quasi Natural Hazard)।
  - (3) কেবলমাত্র মানুষের অপরিণামদর্শিতার ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ (Manmade Hazards)।
- ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি প্রভৃতি দুর্যোগ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক

### 11.1.1 বিপর্যয় নিয়ে দ্বিমত (Disagree with the disaster) :

বন্যার মতো নদীপাড় ক্ষয়ের বিষয়টিকে অনেক বিশেষজ্ঞই বিপর্যয় মানতে দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছেন। কারণ বিগত দুই দশক আগেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নদীপাড়ের ক্ষয়কে দুর্যোগ ধরাই হত না। বিশেষ করে কোনো কোনো ভৌগোলিক মনে করেন, নদী পাড়ের ভাঙা-গড়ার খেলাটি আসলে নদীপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের সামঞ্জস্যবিধান মাত্র। সমস্ত নদীপাড় বিশ্লেষণেই দেখা গেছে, নদীর একদিকের পাড় যেমন ক্ষয়ের মাধ্যমে সংকীর্ণ হয়েছে, একইভাবে নদীর বিপরীত দিকের পাড়টি সঞ্চারকার্যের প্রাধান্যে অত্যন্ত প্রশস্ত হয়ে উঠে পারস্পরিক ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে।



চিত্র-11.2 : নদীপাড় ক্ষয়ের বিভিন্ন অবস্থা

তবে, সাম্প্রতিককালে বন্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিটি নদী অববাহিকায় এই ধরনের পাড় ক্ষয় সংক্রান্ত দুর্যোগ যেভাবে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার বহু গ্রাম বা শহর, চাষযোগ্য জমি, ভূসম্পত্তি পুরোপুরি নদীখাত বরাবর তলিয়ে গেছে।

এমনকী এই ধরনের ঘটনাগুলিতে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি, অনেকে প্রাণও হারিয়েছেন। এই সমস্ত ভয়াবহ বিপদের পরেও যে কয়েকজন মানুষ বেঁচে গেছেন, সেখানে তারা সহায়-সম্বলহীন হয়ে ক্রমশ বুভুক্ষু ভিখারিতে উপনীত হয়েছেন। সামগ্রিকভাবে মানুষের এই অসহায় পরিণতি দেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নদীপাড় ক্ষয়কে দুর্যোগরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশেষ করে 2015 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার *International Federation of Red Cross and Red Crescent Society*-র প্রধান **Bob Macrow** নদীপাড়ের ক্ষয়কে "Slow, Silent Disaster" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

### 11.1.2 নদীপাড় ক্ষয়ের মাত্রা (Dimension of riverbank erosion) :

যে-কোনো নদীর পাড় বরাবর ক্ষয়কার্যের মাত্রা তিন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন—

- (1) **মস্তকমুখী ক্ষয় (Headward erosion) :** নদীর মস্তকমুখী ক্ষয়কার্য মূলত নদীপ্রবাহের সামনের দিকগুলিতে ঘটে থাকে। এই ধরনের প্রভাবে নদী দৈর্ঘ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তবে, নদী-অববাহিকা অঞ্চলের অন্যান্য জলধারাও মস্তকমুখী ক্ষয় করে নদীপাড়গুলিকে বিধ্বস্ত করে। সাধারণত যে সমস্ত নদ-নদীর জলধারণ ক্ষমতা যত বেশি, তার মস্তকমুখী ক্ষয়ের মাত্রাও তত বেশি। অনেক সময় অধিক মস্তকমুখী ক্ষয় প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে নদীগ্রাস (River capture)-এর মতো ঘটনা ঘটে, যা নদীপাড় ভাঙনের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেয়।



চিত্র-11.3 : নদীপ্রবাহের দ্বারা মস্তকমুখীক্ষয়

- (2) **উল্লম্ব ক্ষয় (Vertical erosion)** : নদীপাড়ের উল্লম্ব ক্ষয় সর্বাধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায় নদীর উচ্চগতিতে। এখানে ভূমির ঢাল সবচেয়ে বেশি থাকে বলে, নদীর প্রবল শক্তি উল্লম্ব ক্ষয়ে সহায়ক হয়ে ওঠে। কোনো নদীতে উল্লম্ব ক্ষয়ের মাত্রা বেশি থাকলে, নদীপাড়ের সর্বোচ্চ অংশ এবং নদীখাতের সর্বনিম্নাংশের মধ্যে উচ্চতাগত ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে।



চিত্র-11.4 : নদীপাড়ের উল্লম্ব ক্ষয়



চিত্র-11.5 : নদীপাড় বরাবর উল্লম্ব এবং পার্শ্বীয় ক্ষয়

- (3) **পার্শ্বীয় ক্ষয় (Lateral erosion)** : পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নদী-অববাহিকায় পার্শ্বীয় ক্ষয়প্রবণতাই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের সৃষ্টি করে থাকে। নদীর মধ্য এবং নিম্ন গতি প্রবাহে এই ধরনের পার্শ্বীয় ক্ষয়ে পার্শ্ববর্তী জনপদগুলিকে ক্রমশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

### 11.1.3 নদীপাড় ক্ষয়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of River Bank Erosion) :

নদীপাড় ক্ষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- নদী অববাহিকা অঞ্চলে ভূমিগ্রাস এবং ভূমিধসের একটি সমন্বয়ী রূপ হল নদীপাড়ের ক্ষয়।
- নদীখাত এবং পাড় মধ্যস্থ শিলাস্তর বরাবর স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক পীড়ন নদীপাড় ক্ষয়ে কার্যকরী হয়।
- নদীপাড় ক্ষয়ের নিয়ত প্রক্রিয়া বছরের প্রায় সমস্ত সময় ধরেই কমবেশি চলতে থাকে।
- অনেকসময় নদীপাড় ক্ষয় এত ধীরগতিতে ঘটে, যাকে খালি চোখে সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না।
- নদীপাড় ক্ষয়ে নদীর গতিপথের ভাঙা-গড়ার ভারসাম্য বজায় থাকলেও, জনজীবনের নিরিখে এটি একটি দুর্ভোগবহুল প্রতিকূল পরিস্থিতি।
- মানুষের বাসস্থান ও জীবিকাসংস্থানের দিক থেকে নদীপাড় ক্ষয় একটি সার্বিক 'কীর্তিনাশা' প্রক্রিয়া।
- নদীপাড় ক্ষয়ের ফলে নদীখাতগুলি আয়তনে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে জনবসতি অঞ্চলের দিকে সরে যায়।

➤ **দৃষ্টান্ত (Example)** : আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি নদীপাড় ক্ষয় বিধ্বস্ত

দেশ। এদেশে বিগত চার দশকে প্রায় 71,610 হেক্টর জমি নদীগর্ভে চলে গেছে, যা এখানকার একটি গোটা জেলার প্রায় সমান। ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলেও নদীর পাড়গুলি বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় ধরে ব্যাপক ক্ষয়ের কবলে পড়ে। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্ষয়ের ঘটনায় প্রতিবছর প্রায় অসংখ্য মানুষ চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। এখানকার নদীপাড় ক্ষয়ে বিপর্যস্ত কয়েকটি জেলা হল—মালদহ, মুরশিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি। এ ছাড়াও ভারতের অপর একটি উল্লেখযোগ্য নদীপাড় ক্ষয় বিধ্বস্ত অঞ্চল হল অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা।

### □ সারণি-1 : ব্রহ্মপুত্র নদের পাড় ক্ষয় সমীক্ষা □

সমীক্ষার সময়কাল	ক্ষয়প্রাপ্ত ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকার আয়তন
1. প্রথম সমীক্ষা (1912-28)	3,870 Km <sup>2</sup>
2. দ্বিতীয় সমীক্ষা (1963-75)	4,850 Km <sup>2</sup>
3. তৃতীয় সমীক্ষা (2006)	6,080 Km <sup>2</sup>

Source : NESAC

সরাসরি নদীপাড় ক্ষয়ে প্রভাব বিস্তার করে। **যেমন**—আর্দ্র ঋতুতে অধিক জলপ্রবাহ নদীপাড় ক্ষয় বৃদ্ধি করে।

- (5) **নদীর বোঝা (River load)** : নদীর অতিরিক্ত বোঝা পরোক্ষভাবে নদীর শক্তি বৃদ্ধি করে নদীপাড় ক্ষয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।
- (6) **শিলার প্রকৃতি (Nature of rock)** : নদীপাড়-মধ্যস্থ শিলার কাঠিন্যতা (hardness) বা কোমলতা (softness) সরাসরি নদীপাড় ক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। **যেমন**—কোমল শিলাস্তর গঠিত নদীপাড়গুলি কঠিন শিলাস্তরের নদীপাড়ের চেয়ে দ্রুত এবং অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত পায়।
- (7) **নদী বাঁক (Meandering)** : নদী যখন অধিক বাঁক-বিশিষ্ট হয়, তখন পাড়গুলিতে নদীপ্রবাহের জল বেশি পরিমাণে বাধা পায়, যা নদীপাড় ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে।

নদীপাড় ক্ষয়ের মাত্রা ↓ উচ্চ ↓ মধ্যম ↓ অধিক					
নদীপাড় ক্ষয়ের প্রভাব	নদীপাড়ের উচ্চতা বনাম নদীপাড়ের গভীরতা	নদীপাড়ের কৌণিক ভঙ্গি	শিকড়যুক্ত এবং শিকড়বিহীন নদীপাড়ের ক্ষয়ের প্রবণতা	স্তরবিহীন এবং স্তরিত মৃত্তিকায়ুক্ত নদীপাড়	নদীপাড়ের উপাদানগত আয়তন

চিত্র-11.10 : নদীপাড়ের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং ক্ষয়ের মাত্রা

প্রসঙ্গত, 1998 খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ **Kinghton** নদীপাড় ক্ষয়ে সহায়তাকারী যে কয়েকটি বিশেষ উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল—

- (i) **নদীখাতের জ্যামিতি (Geometry of riverbed)** : **যেমন**—নদীর গভীরতা, নদীখাতের ঢাল, নদীখাতের বিস্তৃতি, বাঁকের বক্রতার পরিমাণ, নদীপাড়ের উচ্চতা ও কৌণিক পরিমাণ প্রভৃতি।
- (ii) **প্রবাহের প্রকৃতি (Nature of stream)** : **যেমন**—নদীর জলপ্রবাহের মাত্রা, জলধারার বিস্তৃতি, ঘূর্ণিসৃষ্টি, জলের আন্দোলন, জলনির্গমনের সময়গত পার্থক্য প্রভৃতি।
- (iii) **জলবায়ু (Climate)** : **যেমন**—বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব, ঘনত্ব, বন্টন, শীতলীকরণ হার, উষ্ণতা-আর্দ্রতাভিত্তিক চক্র প্রভৃতি।
- (iv) **উপপৃষ্ঠীয় অবস্থা (Surface condition)** : **যেমন**—পৃষ্ঠপ্রবাহের প্রকৃতি, পৃষ্ঠপ্রবাহের চাপ, মাটির আর্দ্রতাগত মাত্রা, জলসরবরাহের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।
- (v) **জৈবিক প্রভাবক (Organic factors)** : **যেমন**—উদ্ভিদের আস্তরণ ও তার ঘনত্ব, মৃত্তিকাস্থিত প্রাণীদের অবস্থান, মানবীয় কার্যাবলি প্রভৃতি।



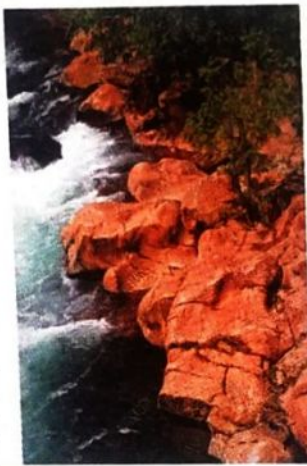
## 11.1.6 নদীপাড় ক্ষয়ের কারণসমূহ (Causes of riverbank erosion) :

নদীপাড় ক্ষয়ের পরিস্থিতির জন্য একাধিক প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণকে দায়ী করা যায়, এগুলি হল—

## □ প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Natural Causes)

1. **জলপ্রবাহের প্রকৃতি (Nature of streams)** : প্রাথমিকভাবে নদীপাড় ক্ষয়ের অন্যতম কারণরূপে নদী শক্তির মাত্রাগত প্রকৃতি বিশেষভাবে জড়িত। প্রতিটি নদীখাত সংলগ্ন অঞ্চলে জলপ্রবাহের একটি নির্দিষ্ট বেগ বা স্বাভাবিক মাত্রা থাকে। কিন্তু কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে এই জলপ্রবাহ অস্বাভাবিক আকার ধারণ করলে, জলের প্রবল আঘাত সংশ্লিষ্ট নদীপাড়গুলিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রসঙ্গত, নদীখাতে অতিরিক্ত জলপ্রবাহ নদীপাড়ে যে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, তা সহ্য করতে না পেরে পাড়ের দুর্বল অংশগুলিতে একাধিক ছোটো ছোটো ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটলগুলি আয়তনে ক্রমশ বেড়ে নদীপাড়ের ক্ষমতাকে যখন বিনষ্ট



চিত্র-11.11 : নদীপাড়ের জলপ্রবাহ ক্ষয়

করে দেয়, যখন শেষপর্যন্ত পাড়ের দুর্বল অংশগুলি নদীতে খসে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, খসে পড়া পাড়ের অংশ নদীখাতে ক্রমান্বয়ে জমতে থাকলে, তাতে জল ধাক্কা খেয়ে সাময়িক ঘূর্ণিতে পরিণত হয়, যা নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

2. **জলবায়ুগত প্রভাব (Climatic factors)** : নদীপাড় ক্ষয়ের ক্ষেত্রে জলবায়ুগত প্রভাবকগুলি সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে, কোনো নদী-অববাহিকা অঞ্চলে যদি অধঃক্ষেপণের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে বৃষ্টিপাত বা তুষারগলা জল একাধিক ছোটো ছোটো খাতে বিভক্ত হয়ে পাড়ের মধ্য দিয়ে নদীতে গিয়ে মেশে। এর ফলে নদীপাড়গুলি দ্রুত ধুয়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **যেমন**—প্রতিবছর বর্ষাঋতুতে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই কারণে নদীপাড় ক্ষয়ের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

3. **নদীর প্রকৃতি (Nature of river)** : আমরা আগেই জেনেছি, নদীপাড় ক্ষয়ে নদীর প্রকৃতিগত উপাদানগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নদীর প্রকৃতি সংক্রান্ত যেসমস্ত বিষয় নদীপাড় ক্ষয়ে সরাসরি প্রভাব ফেলে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

(i) নদীখাত অগভীর এবং মসৃণ হলে প্রবাহিত অতিরিক্ত জলের ধাক্কা নদীখাত প্রতিহত করতে পারে না, ফলে পাড় ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। **যেমন**—বিহারের কোশি নদী অববাহিকায় এই অবস্থা দেখা যায়।

(ii) যে সমস্ত নদীতে অসংখ্য অবতল বাঁক রয়েছে, নদীজল তাতে বাধা পেয়ে ঘূর্ণির আকারে নদীপাড় ক্ষয়ে অংশ নেয়। **যেমন**—গঙ্গা মুরশিদাবাদের কাছ থেকে প্রবেশ করার পর যে অসংখ্য বাঁক সৃষ্টি করেছে, তার প্রভাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক নদীপাড় ক্ষয় ঘটতে দেখা যায়।

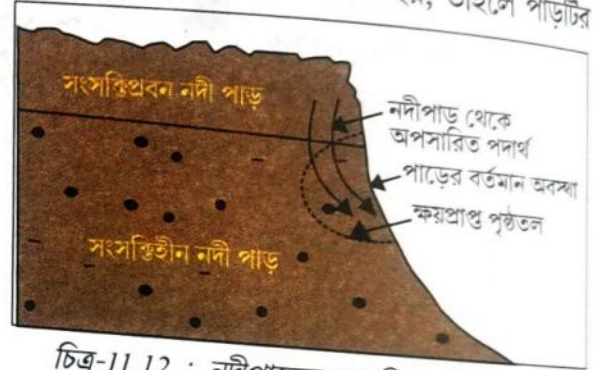
(iii) নদীবক্ষে যদি একাধিক চরের উপস্থিতি থাকে, তাহলে চরগুলিতে নদী প্রবাহ বাধা পেয়ে ক্ষয়কারী

শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যেমন—অসমের ব্ৰহ্মপুত্র নদে এই ধরনের ক্ষয়প্রবণতা সর্বাধিক হারে লক্ষ করা যায়।

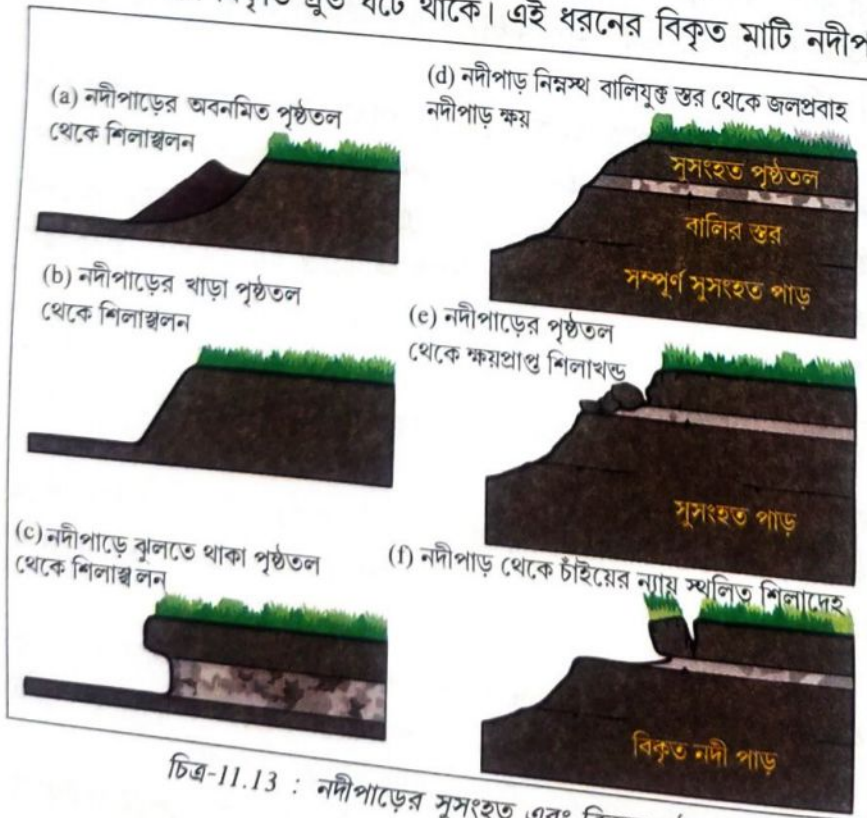
- (iv) নদীপাড়গুলি যদি কোমল শিলায় গঠিত হয়, তাহলে নদীপাড় দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন—কোমল শিলায় গঠিত উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদীপাড় এই কারণে যথেষ্ট ক্ষয়গ্রস্ত।
- (v) নদীর যত পরিণতি প্রাপ্তি ঘটে, ততই নদীখাতের বক্রতা, প্রশস্ততা, জলের পরিমাণ, এমনকি জলের বোঝার পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়। সম্মিলিত এই প্রত্যেকটি পরিস্থিতিই নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দেয়। যেমন—গঙ্গার মোহনা সংলগ্ন অংশের নদীপাড় ক্ষয়ে উল্লিখিত পরিস্থিতি বিশেষভাবে দায়ী।

**4. ভূতাত্ত্বিক গঠন (Geological structure) :** নদী-অববাহিকা অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন নদীপাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনা তৈরি করে। সাধারণত যদি কোনো নদীপাড় ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে অস্থিতিশীল হয়, বিশেষ করে সেটি দারণ, চ্যুতিবিশিষ্ট, প্রবেশ্য কিংবা আলগা প্রকৃতির গঠন বিশিষ্ট হয়, তাহলে পাড়টির ক্ষয়প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট নদীপাড়টি ক্রমাগত জলের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে কোনও একসময় নদীখাত বরাবর ধসে পড়ে।

**5. মৃত্তিকার প্রকৃতি (Nature of soil) :** মাটির প্রকৃতির সঙ্গে ভূমিক্ষয়ের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণত নদীপাড় মধ্যস্থ মাটির প্রথন যদি দুর্বল হয়, বিশেষ করে মাটি আলগা, ভঙ্গুর বা ছিদ্রযুক্ত কোমল প্রকৃতির হলে—জলের দ্বারা তার বিকৃতি দ্রুত ঘটে থাকে। এই ধরনের বিকৃত মাটি নদীপাড়ের দ্রুত ক্ষয় ঘটিয়ে পাড়ের ভারসাম্য



চিত্র-11.12 : নদীপাড়ের ভূতাত্ত্বিক গঠন ও ক্ষয়ের পৃষ্ঠতল



চিত্র-11.13 : নদীপাড়ের সুসংহত এবং বিকৃত গঠন

বিঘ্নিত করে। যেমন—নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার দুর্বল শিলায় গঠিত নদীপাড়গুলি প্রবল বর্ষায় দ্রুতহারে ক্ষয় পেয়ে থাকে।

**6. উদ্ভিদের স্বল্পতা (Lack of Vegetation) :** সাধারণত উদ্ভিদের শিকড় মাটিতে আঁকড়ে ভূমিক্ষয়কে প্রতিরোধ করে থাকে। কিন্তু নদীপাড় সংলগ্ন অঞ্চলে উদ্ভিদের পরিমাণগত অভাব থাকলে, মাটি অসংলগ্ন অবস্থায় রয়ে যায়, ফলে নদীপাড়ের ক্ষয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

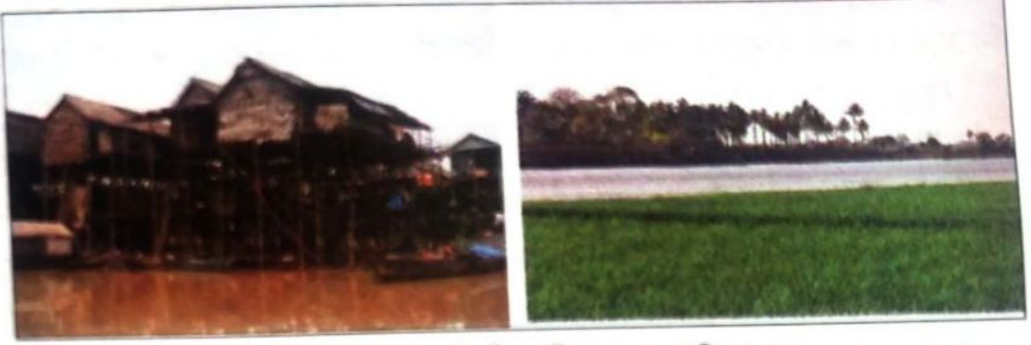
এ ছাড়াও, যে সমস্ত নদীপাড় প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড় বা সুনামির সম্মুখীন হয়, তার ক্ষয়ের মাত্রা উল্লিখিত সমস্ত ঘটনাগুলিকে ছাপিয়ে যায়।

## □ মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহ (Man-made Causes)

নদীপাড় ক্ষয় যে শুধু প্রাকৃতিক কারণে ঘটে তেমনটা নয়, বেশ কিছু মনুষ্যসৃষ্ট কারণও নদীপাড় ক্ষয়ে সরাসরি জড়িত। এগুলি হল—

### 1. জনবসতির বিস্তার (Settlements expansion) : নদীপাড় ক্ষয়ের মনুষ্যসৃষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

কারণ হল নদীপাড় সংলগ্ন অঞ্চলে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় জনবসতির বিস্তার। পৃথিবীতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্থান সংকুলানের অভাবকে দোহাই



চিত্র 11.14 : নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ভূমিব্যবহার

দিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত অপরিবর্তিতভাবে নদীপাড় বরাবর বসতি নির্মাণ করে চলেছে। এর ফলে নদীপাড়ের ওপর চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষয়সংক্রান্ত দুর্যোগকে অনিবার্য করে তুলেছে।

### 2. কৃষিকাজ (Agriculture) : সাধারণত নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি ফসল ফলানোর উপযোগী উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ হওয়ার, এখানে ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে। কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে অনিয়ন্ত্রিত ভূমিকর্ষণ, জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, মাটি কেটে জমিতে আল দেওয়া প্রভৃতি কারণগুলি নদীপাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

### 3. অবৈধ নির্মাণ (Illegal construction) : বেশির ভাগ নদীপাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টিত স্থানগুলিতে ব্যাণ্ডের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা পিকনিক স্পটকে কেন্দ্র করে একাধিক হোটেল বা লজ, রাস্তাঘাট অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়। এই সমস্ত অবৈধ নির্মাণকাজ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যে ভয়াবহ নদীপাড় ভাঙনের পরিস্থিতি তৈরি করে, তার অনিবার্য ফল ভুগতে হয় সংশ্লিষ্ট নদীপাড়ে থাকা জনবসতিগুলিকে।

### 4. বনভূমি বিনাশ (Deforestation) : নদীপাড় বরাবর রাস্তাঘাট নির্মাণ, নতুন বসতি বা দোকানবাজার নির্মাণ, কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতির ফলে প্রচুর পরিমাণে বনভূমি বিলোপ করা হয়। এর ফলে নদী পাড়-সংলগ্ন মাটি ক্রমশ আলগা হয়ে গিয়ে ক্ষয়ের মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করে।

### 5. পশুচারণ (Grazing) : নদীপাড় বরাবর অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে সেখানকার মাটিতে ছোটো ছোটো গর্তের সৃষ্টি হয়। এই গর্তগুলিতে জল জমতে থাকলে সেগুলি আয়তনে বেড়ে যায় এবং কালক্রমে পাড়ে ফাটল ধরায়। সেই ফাটলগুলিই জলধারার ক্রমাগত আঘাতে একসময় নদীবক্ষ বরাবর স্থলিত হয়।

### 6. শিল্পজাত বর্জ্য (Industrial wastages) : অধিকাংশ শিল্প-কারখানাগুলি বড়ো বড়ো নদী-তীরবর্তী অঞ্চল বরাবর গড়ে ওঠে। এই সমস্ত শিল্পকেন্দ্রগুলির উৎপন্ন বর্জ্যের অনেকটাই নদীপাড়গুলিতে ফেলা হয়। এর ফলে নদীপাড় সংলগ্ন স্থানগুলির মাটির দৃঢ়তা নষ্ট করে দিয়ে ক্ষয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

### 7. স্নানের ঘাট (Bathing ghat) : পৃথিবীর অধিকাংশ নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ তাদের বিভিন্ন নিত্যক্রিয়া (শৌচ কর্ম, স্নান, জামা কাপড় কাচা প্রভৃতি) সম্পন্ন করার জন্য, নদীপাড় বরাবর অস্থায়ী স্নানের ঘাট বেঁধে থাকে। এর প্রভাবে নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রা যথেষ্ট হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন—গঙ্গার উভয় পাড়ে এই ধরনের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

## 11.2 নদীপাড় ক্ষয়ের বিপন্নতা (Vulnerability of riverbank erosion) :

নদীপাড় ক্ষয়ের সমস্যাটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মহাদেশেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রতিদিন একটু একটু করে ঘটতে থাকা নদীপাড়ের ক্ষয় মানুষকে একাধিক বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তাদের সহায়সম্বলহীন করে তোলে। নদীপাড় ক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের এই ধরনের বিপন্নতা একাধিক কারণে নেমে আসে, যেমন—

**প্রথমত**, সভ্যতা গঠনের শুরু থেকেই বসতি নির্মাণের কেন্দ্রস্থলরূপে মানুষ নদী-তীরবর্তী স্থানগুলিকে বেছে নিয়েছিল। তাই মানুষের বাসস্থানের পরিসরটিতে এই নদীপাড় ক্ষয়ের বিপন্নতা সর্বাধিক গ্রাস করেছে।

**দ্বিতীয়ত**, প্রায় সমস্ত নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি হল চাষাবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুকূল স্থল। মানুষের খাদ্য উৎপাদনের জন্য এই এলাকাটির ওপর অধিক নির্ভরশীলতা অনেকক্ষেত্রে বিপন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

**তৃতীয়ত**, মানুষ নদীপাড়ের আশেপাশের অঞ্চলকেই জীবিকানির্বাহের জন্য বেছে নেয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত নদীপাড় ভাঙন সংক্রান্ত পরিস্থিতি মানুষের জীবিকাগত ক্ষেত্রটিকেও বিপন্ন করে তোলে।

কাজেই যেখানে মানুষের জীবন ও জীবিকা সার্বিকভাবে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, সেখানে বিপন্নতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। নদীপাড় ক্ষয়ের পৃথিবীব্যাপী বিপন্নতার প্রতিচ্ছবি নিম্নলিখিত বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তে আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

- (i) কোনো ভূখণ্ডকে নদী একবার যদি গ্রাস করে ফেলে, তাকে পূর্বের অবস্থায় পুনরায় ফিরিয়ে আনা কখনোই সম্ভব হয় না।
- (ii) সমস্ত দুর্বল নদীপাড় এলাকা বরাবর দীর্ঘকাল ধরে অনবরত ক্ষয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।
- (iii) সমগ্র পৃথিবীর স্থলভাগের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতি বছর গড়ে 26.4 বিলিয়ন টন মাটির অপসারণ ঘটে থাকে, যার সিংহভাগই নদীপাড় ক্ষয়ের সঙ্গে জড়িত।
- (iv) নদীপাড় ক্ষয়ের প্রভাবে পৃথিবীব্যাপী প্রায় কয়েকহাজার মানুষ তাদের বসতি অঞ্চল থেকে বিচ্যুত হয়।
- (v) পৃথিবীর আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলভিত্তিক নদীপাড় ক্ষয়ের গড় হার 30-60 বর্গকিমি/বছর।
- (vi) পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীপাড়ের ক্ষয়ের মাত্রা সর্বাধিক। বিগত তিরিশ বছর ধরে বাংলাদেশ যে পরিমাণ জমি নদীপাড় ক্ষয়ের মাধ্যমে হারিয়েছে, তার মোট পরিমাণ সেখানকার একটা বড়ো জেলার মোট আয়তনের সমান।
- (vii) ভারতের গঙ্গা নদীর ধারণ-অববাহিকার 1.09 মিলিয়ন বর্গকিমি স্থানের প্রায় 15-20% এলাকা সর্বাধিক ক্ষয়প্রবণ।
- (viii) নদীপাড় ক্ষয়ের জন্য ভারতের শুধুমাত্র অসম উপত্যকা বিগত কয়েক দশকে তার মোট ভূখণ্ডের প্রায় 7.4% অংশ হারিয়েছে।
- (ix) নদীপাড় ক্ষয়ের প্রভাবে পৃথিবীর মোট কৃষিজমির প্রায় 2-5% ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- (x) ক্রমাগত নদীপাড় ক্ষয়ের পরিস্থিতি পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে থাকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, চীন, ব্রাজিল প্রভৃতি।

### 11.2.1 মহাদেশভিত্তিক ক্ষয় প্রবণতা ও বিপন্নতা (Continent-based erosional tendency and vulnerability) :

বিভিন্ন মহাদেশভিত্তিক নদীপাড়ের ক্ষয় প্রবণতাকে নিম্নলিখিত আলোচনায় উপস্থাপন করা হল।

☉ **এশিয়া (Asia)** : নদীপাড় ক্ষয়ের দিক থেকে পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশ হল এশিয়া। সমগ্র মহাদেশটিতে অসংখ্য নদনদী বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকলেও, এখানকার দক্ষিণ-পূর্বভাগেই নদীপাড় ক্ষয় সর্বাধিক হারে লক্ষ করা যায়। কারণ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত এই অংশটি সক্রিয় একটি আর্দ্র অঞ্চল। তাই ঋতুভিত্তিক অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে, এখানকার নদীগুলিতে যেমন জলের জোগান যথেষ্ট বেড়ে যায়, একইভাবে ভূপৃষ্ঠ প্রবাহের সর্বাধিক মাত্রা নদীপাড় ভাঙনে অতি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।